গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলের দুই দশক পূর্ণ হয়েছে। এবার ২০২০ সালে সেই স্কুল চালু করার ২০ বছর পূর্ণ হলো। সেই স্মৃতিকে স্মরণে রেখে আমরা শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে কিছু কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের মতো একটি অতি জনবহুল দেশের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক রূপান্তরের প্রধানতম কৌশল হতে হবে এর মানবসম্পদকে সবার আগে ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন করা। রোববার (২৬ এপ্রিল) ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য জানা যায়।

নিবন্ধে আরও জানা যায়, এ দেশের মানবসম্পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি তিরিশের নিচের বয়সী। এই জনসংখ্যারও বিরাট অংশ এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে কেরানি হওয়ার দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত। অন্যরাও প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম। শিক্ষারতদের দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যটিকে জ্ঞানকর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের নিজের দেশে বা বাইরের দুনিয়াতে কায়িক শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিক হিসেবে যাদের কাজে লাগানো যাবে তার বাইরের পুরো জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে।

বস্তুত প্রচলিত ধারার শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বাড়তি কোনো প্রয়োজনীয়তা হয়তো আমাদের থাকবে না। কারণ যে তিরিশোর্ধ্ব জনগোষ্ঠী রয়েছে বা যারা ইতোমধ্যেই প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের প্রচলিত কাজ করার দক্ষতা রয়েছে এবং তারাই এ খাতের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। ফলে নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায় জ্ঞানকর্মী বানানোর কাজটাই আমাদের করতে হবে। এর হিসাবটি একেবারেই সহজ। বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে জ্ঞানকর্মী সৃষ্টির কারখানা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি বস্তুত একটি রূপান্তর। প্রচলিত দালানকোঠা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চি বহাল রেখেও এর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে যাত্রা শুরু করা যায়।

আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পুরো শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত পরিবর্তন করা। বিরাজমান শিক্ষাকে একটি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তর করার মধ্য দিয়েই কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সব কিছুকে ডিজিটাল করেই এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এজন্য জাতিগতভাবে কাজ আমরা শুরু করেছি। একটি বড় উদ্যোগ হলো বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মাঝেই আমাদের স্কুলের ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম-নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পরিকল্পনা আছে একে প্রাথমিক স্তরেও বাধ্যতামূলক করার। আমরা এরই মাঝে সরকারিভাবে ২৩ হাজার ৫০০ ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করেছি। ১০ হাজারের বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমরা শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। স্থাপন করছি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরি করা শুরু করেছি ডিজিটাল কনটেন্টস। আমার নিজের হাতেই রয়েছে নার্সারি, কেজি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ডিজিটাল শিক্ষার জন্য সফটওয়্যার। দেশজুড়ে গড়ে তোলা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল স্কুল ছাড়াও হাজার হাজার স্কুল ও লাখো শিক্ষার্থী এসব ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার দিয়ে পড়াশোনা করছে। স্কুল ব্যবস্থা বা ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার জন্যও সফটওয়্যারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এমনকি হাজিরাও ডিজিটাল হচ্ছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার যতটা ঘটেছে সেই রূপান্তরের যে প্রয়াস রয়েছে উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তেমনটা দৃশ্যমান নয়। প্রথমেই বলা যেতে পারে শিক্ষাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করতে প্রাথমিক করণীয় কী হতে পারে।

ক. প্রথমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিশুশ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নম্বর হলেও মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে ১০০। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এর মান হতে হবে ২০০। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি নির্বিশেষে সবার জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে স্ক্র্যাচ জুনিয়র ও স্ক্র্যাচ এবং মাধ্যমিক স্তরে পাইথন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সি++ পাঠ্য করা যেতে পারে। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্তর থেকেই রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দিতে হবে। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ধীরে ধীরে গুরুত্ব বাড়াতে হবে। উচ্চশিক্ষার সব স্তরে মৌলিক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াদি পাঠ্য করতে হবে। এমনকি সেটি মাদ্রাসার উচ্চস্তরেও করতে হবে।

খ. দ্বিতীয়ত, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কম্পিউটার হিসেবে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এই কম্পিউটারগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে নিজেরা এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মাঝে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট দেয়া রাষ্ট্রের বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকার এখন যে পাঁচ শতাধিক সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছে তা প্রাথমিক স্তর থেকে সব স্তরে প্রসারিত করতে হবে।

গ. তৃতীয়ত, প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা, কলম, বইকে কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্টফোন, বড় পর্দার মনিটর/টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। আমি নিজে খুব স্বল্প খরচে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলার পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করব।

ঘ. চতুর্থত, সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেইসব কনটেন্টসকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যমান পাঠক্রম হুবহু অনুসরণ করা যাবে না এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমে কাগজের বই দিয়ে শিক্ষা দান করা যাবে না। কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয় তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এসব কনটেন্টকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারঅ্যাকটিভ হতে হবে।

ঙ. পঞ্চমত, সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব আয়োজন বিফলে যাবে যদি শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবহার করতে না পারেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে না জানেন। তারা নিজেরা যাতে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন তারও প্রশিক্ষণ তাদের দিতে হবে।

চ. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে ও শিক্ষার্থীদের তাদের হাতের ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে ইন্টারনেটে যুক্ত থাকতে হবে।

কেমন করে ডিজিটাল স্কুল করবেন : ডিজিটাল বা মাল্টিমিডিয়া স্কুল সাধারণ স্কুলই হবে। স্কুল গড়ে তোলার সব অবকাঠামো নিজেকেই করতে হবে। এতে বিনিয়োগ হবে উদ্যোক্তার। সঙ্গতকারণেই এর স্বত্বও থাকবে উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা নিজেই এটি পরিচালনা করবেন। লাভ-লোকসান বা আয়-ব্যয় সবই উদ্যোক্তার। কেবল বিজয় ডিজিটাল স্কুল বা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল নামে স্কুল করতে হলে ফ্রান্সাইসি চুক্তি করতে হবে। কারণ এই নামটি ট্রেডমার্ক নিবন্ধিত। প্রচলিত স্কুলের মতো করেই স্কুল গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি স্কুলকেও ডিজিটাল স্কুল বা মাল্টিমিডিয়া স্কুলে রূপান্তর করা যাবে। সব ক্ষেত্রেই ইতোপূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। শিশুশ্রেণি থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ক্লাসরুমগুলো পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ক্লাসরুমে রূপান্তরিত করতে হবে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করতে হবে। স্কুলের হাজিরা থেকে ব্যবস্থাপনা এবং ক্লাসরুম শিক্ষা ডিজিটাল করতে হবে। ডিজিটাল কনটেন্ট বা বিজয়ের ডিজিটাল শিক্ষামূলক সফটওয়্যার দিয়ে পড়াতে হবে।

প্লে-নার্সারি-কেজি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি আছে বলে এই ক্লাসগুলো দিয়েই শুরু করা যায়। প্রচলিত স্কুলের পাঠক্রমে শিশুশ্রেণি থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এদের জন্য বাজারে আমার লেখা বইও রয়েছে। এখন কেবল একটি স্মার্ট টিভি যাতে এন্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চলে সেটা দিয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু করা যেতে পারে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে মাত্র হাজার চল্লিশেক টাকায় একটি ক্লাসে ডিজিটাল শিক্ষা দেয়ার জন্য ৫০ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি সংগ্রহ করা যেতে পারে। গত ২ মে ২০১৯ আমি এমন একটি টিভিতে আমাদের সফটওয়্যার চালিয়ে দেখেছি যে এটি একটি চমৎকার সমাধান। গোয়ালন্দের একটি স্কুলে এখন এই পদ্ধতিতে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। আমরা এর একটি আরো উন্নত সংস্করণ পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি যাতে প্রোগ্রামিংও শেখানো যেতে পারে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাকে ডিজিটাল করার জন্য এ ধরনের সমাধান ব্যাপকভাবে সহায়ক হতে পারে। এর বাইরে ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরির জন্য অন্য উপায়ও গ্রহণ করা যায়। একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার ও একটি ৫০ ইঞ্চি পর্দার টিভি যোগ করলেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান শুরু করা সম্ভব।

মোস্তাফা জব্বার : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও কলাম লেখক।